কিশোর কল্পবিজ্ঞান সমগ্র

নীল মানুষের কাহিনি

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

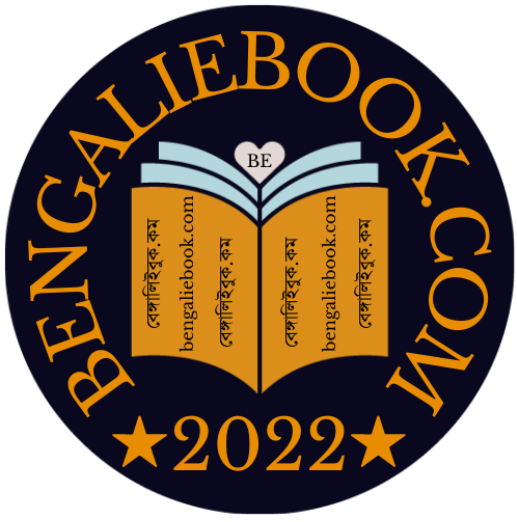

নীল মানুষের কাহিনি

দোতলার বারান্দায় পাপু একা-একাই একটা বল নিয়ে খেলছিল। একবার বলটা রেলিং টপকে পড়ে গলে পেছনের মাঠে।

পেছন দিককার মাঠটায় বড়-বড় ঘাস জন্মে গেছে। মাঠের ওপাশে বড় বড় গাছের একটা বাগান। সেখানে আম, জাম, লিচু গাছ ছাড়াও অনেকগুলো বাঁশ গাছ আছে। সেই বাঁশবনে নাকি রাত্তিরবেলা শাঁকচুন্নিরা আসে। তারা মাঝ রাত্তিরে নাকি সুরে শিয়ালের মতন গান গায়। এদিকে পাপুর একা যাওয়া নিষেধ।

এখন কেউ দেখছে না বলে পাপু মাঠে নেমে এল বলটা খুঁজতে। কিন্তু বলটাকে দেখতে পেল না। নিশ্চয়ই ঘাসের মধ্যে লুকিয়েছে। বলগুলো মাঝে-মাঝে ইচ্ছে করে লুকিয়ে পড়ে।

বলটা খুঁজতে খুঁজতে পাপু চলে এল বাগানের কাছে। তারপরই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। একটা বড় জামরুল গাছের পাশে লুকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে একটা লোক। এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তাদের বাড়ির দিকে।

পাপু প্রথমে ভেবেছিল নিশ্চয়ই লোকটা চোর। তারপরই মনে হল, চোর নয়, একটা দৈত্য। কিংবা বকরাক্ষস।

লোকটা দৈত্যের মতনই লম্বা, মাথায় বড় বড় চুল, গায়ের রং একদম নীল। কোনও মানুষের রং ওরকম হয় না। জানলা-দরজা রং করার মতন কেউ যেন ওকে নীল রং মাখিয়ে দিয়েছে সারা গায়ে।

পাপু পেছন ফিরে দৌড়ে পালাতে যেতেই লোকটা তার নাম ধরে ডাকল, পাপু, শোনো-

তাতে পাপু আরও ভয় পেয়ে গেল। দৈত্যটা তার নাম জানল কী করে? নিশ্চয়ই এবার কপাৎ করে খেয়ে ফেলবে।

পাপু কাঁদো কাঁদো হয়ে বলল, আমি আর করব না! আমি আর কোনওদিন দুষ্টুমি করব না! আমাকে মেরো না!

লোকটা বলল, না, তোমাকে মারব না। তোমার দিদিকে একবার ডেকে দিতে পারো?

পাপু বলল, এক্ষুনি ডেকে দিচ্ছি। আমাকে ছেড়ে দাও?

লোকটা বলল, আমি তো তোমাকে ধরে রাখিনি। তুমি ভয় পেও না।

পাপু তক্ষুনি বাড়ির দিকে দৌড়ল। ঘাসে পা জড়িয়ে পড়ে গেল একবার। উঠে আবার ছুটল।

বারান্দায় উঠেই পাপুর সাহস ফিরে এল। সে তখন বাগানের দিকে ফিরে দৈত্যটার উদ্দেশে বলল, এক লাথি! দিদিকে ডেকে দেব না, ছাই দেব! ভূত আমায় পুত, পেত্নী আমার ঝি, রাম-লক্ষ্মণ বুকে আছে, করবি আমার কী?

পাপুর দিদি চিত্রা একতলাতেই ছিল। সে বলল, এই পাপু, তুই কার সঙ্গে কথা বলছিস?

পাপু বলল, দ্যাখো না দিদি, ওইখানে একটা দৈত্য দাঁড়িয়ে আছে!

চিত্রা হেসে ফেলল। পাপুটা দারুণ গুলবাজ! কত জিনিস যে বানিয়ে বানিয়ে বলে।

চিত্রা বলল, তুই বুঝি দৈত্যকে লাথি মারছিস?

দিদি, দৈত্যটা তোমাকে ডাকছে!

কেন, আমাকে আবার দৈত্যর কী দরকার পড়ল?

ওই দ্যাখো না, দৈত্য হাতছানি দিচ্ছে। ই-ল্-ল্!

পাপু জিভ ভেঙিয়ে দিল। চিত্রা তখন বারান্দায় এসে পড়াতেই পাপু আবার দারুণ উৎসাহে বলল, ওই দ্যাখো, দেখতে পাচ্ছ, বড় জামরুল গাছটার পাশে–

চিত্রর মনে হল, কে যেন গাছের পাশ থেকে সরে গেল। সে তখন চেঁচিয়ে বলল, কে? কে ওখানে?

সবে মাত্র সন্ধে হয়েছে একটু-একটু। এখনও আকাশের আলো যায়নি। এক্ষুনি কি আর চোর আসতে পারে? চিত্রা সাহস করে নেমে এল মাঠে। আবার জিগ্যেস করল, কে?

পাপু বলল, দিদি, যেও না, সত্যি-সত্যি দৈত্য।

তখন বাগানের মধ্য থেকে কেউ একজন ডাকল, চিত্রা, শোনো–

চিত্রা একেবারে কেঁপে উঠল। কী গম্ভীর গলার আওয়াজ। যেন হাঁড়ির মধ্য থেকে কথা বলছে। কিন্তু কে তার নাম ধরে ডাকছে?

সে আবার বলল, কে ওখানে?

এবার জামরুল গাছের আড়াল থেকে লোকটা বেরিয়ে এল। সেই বিশাল চেহারা আর অদ্ভুত নীল রং দেখে চিত্রা পাপুর থেকেও বেশি ভয় পেয়ে গেল। গলায় আওয়াজ বন্ধ হয়ে গেল প্রায়। কোনওক্রমে বলল, ওমা...ওমা...ও...মা...গো!

পেছন ফিরে দৌড়তে গিয়েই অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল চিত্রা। বাগান থেকে বেরিয়ে এসে লোকটা বলল, চিত্রা, ভয় পেও না, আমি রণজয়

দূর থেকে পাপু তখন চাঁচাচ্ছে, ও মা, এসো, বাবা, এসো, ছোটকাকা এসো, দিদিকে দৈত্য ধরে নিয়ে যাচ্ছে–বিরাট দৈত্য!

লোকটা নীচু হয়ে কয়েকবার ডাকল, চিত্রা, চিত্রা-। চিত্রা সত্যিই অজ্ঞান। সে তখন চিত্রাকে পাঁজাকোলা করে তুলে দিয়ে গেল বাগানের মধ্যে।

পাপুর চিৎকারে ছুটে এল চিত্রার মা আর ছোটকাকা। ছোটকাকা এক ধমক দিয়ে বলল, কী পাগলের মতন চাঁচাচ্ছিস?

পাপু লাফাতে লাফাতে বলল, দিদিকে ধরে নিয়ে গেছে, ওই বাগানের মধ্যে শিগগির..

মা আর ছোটকাকা দুজনই ছুটে গেলেন বাগানের দিকে, ছোটকাকাই আগে-আগে। বাগানের মধ্যেই ঢুকে তিনি দেখলেন, চিত্রা মাটিকে পড়ে আছে, আর কী একটা বিশাল জন্তুর মতন ঝুঁকে আছে তার মুখের কাছে।

সঙ্গে-সঙ্গে ছোটকাকা উলটো দিকে ঘুরে চিৎকার করে উঠল, ওরে বাপরে, গোরিলা, কিংকং-বন্দুক, বন্দুক আনতে হবে।

মা তবু এগিয়ে গেলেন। তিনিও দেখলেন, সত্যিই একটা দৈত্যের মতন মানুষ তার মেয়েকে আবার মাটি থেকে তুলে নিচ্ছে।

তিনি কাঁদতে কাঁদতে বললেন, ছেড়ে দাও, আমার মেয়েকে ছেড়ে দাও!

লোকটা মাকে দেখে বলল, ভয় পাবেন না। আমি রণজয়!

মা তাতেই ভয় পেয়ে গেলেন। হাতজোড় করে বলল, তুমি যেই হও, আমার মেয়েকে ছেড়ে দাও! তুমি যা চাও, তাই দেব!

চিত্রার জ্ঞান ফিরে এসেছে, সে মা-মা করে ডেকে উঠল। তারপর লোকটার হাতে কামড়ে দিতেই লোকটা ছেড়ে দিল তাকে।

এর মধ্যে ছোটকাকা চঁচামেচি করে আরও অনেক লোক জুটিয়েছে। লাঠি, দা, শাবল নিয়ে দশ-বারোজন লোক তেড়ে এল বাগানের মধ্যে। দৈত্যের মতন লোকটা দাঁড়িয়েই

ছিল। প্রথম একজন তার গায়ে লাঠির বাড়ি মারতেই সে লাঠিখানা কেড়ে নিয়ে দেশলাই কাঠির মতন পট করে ভেঙে ফেলল। তারপর দৌড়তে লাগল পেছন ফিরে। অন্যেরা তাড়া করে গেল কিন্তু অত বড় লোকটার সঙ্গে দৌড়ে কেউ পারে না! বাগানের পর অনেকটা জলা জায়গা, তারপর জঙ্গল। লোকটা ছপছপ করে জলাভূমির মধ্য দিয়ে দৌড়ে প্রায় চোখের নিমেষে ঢুকে গেল জঙ্গলের মধ্যে। সে পর্যন্ত আর যাওয়ার সাহস হল না কারুর!

নিশানপুর গ্রামে দারুণ একটা উত্তেজনা পড়ে গেল। তারা স্বচক্ষে একটা দৈত্য দেখেছে। কত রকম গল্প তৈরি হতে লাগল তাকে নিয়ে। কেউ বলল, তার মুলোর মতন দাঁত। কেউ বলল, তার চোখ দিয়ে আগুন বেরোয়। কেউ বলল, ওটা দৈত্য নয়, আসলে একটা গোরিলা। কেউ বলল, যাঃ, ভারতবর্ষে গোরিলা থাকে না, ওটা নিশ্চয়ই শিম্পাঞ্জি কিংবা ওরাংওটাং! কেউ বলল, তা কী করে হবে? ও যে কথা বলতে পারে, বাংলায় কথা বলে! কেউ বলল, তা হলে নিশ্চয়ই কোনও তান্ত্রিক সাধক মরাকে জাগিয়েছে।

চিত্রার মা শুধু বিড়বিড় করে বলতে লাগলেন, ও বলেছিল, ওর নাম রণজয়! কেন বলল, ও কথা? মুখটা সিংহের মতন। অদ্ভুত কোনও জন্তুই হবে। চিত্রা কোনও কথা বলে না, শুধু হেঁচকি তুলে কাঁদে। সে এমন ভয় পেয়েছে যে কিছুতেই সুস্থ হতে পারছে না। পাপু লাফালাফি করে বলে, আমি কিন্তু আগে দেখেছি, আমি সবচেয়ে আগে দেখেছি।

সত্যি, পাপু ঠিক সময় চঁচামেচি না করলে দৈত্যটা চিত্রাকে ধরেই নিয়ে যেত। খবরের কাগজেও ছাপা হয়ে গেল, নিশানপুর গ্রামে দৈত্যের আবির্ভাব।

দৈত্যটির নাম কিন্তু সত্যিই রণজয়। কিছুদিন আগেও সে মানুষ ছিল।

জঙ্গলের মধ্যে ঢুকে রণজয় একটা গাছের নিচে বসে হাঁপাতে লাগল। খিদেতে তার পেটের মধ্যে যেন দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। গত চার পাঁচদিন সে কিছুই প্রায় খায়নি। এই জঙ্গলে ফলমূল প্রায় কিছুই নেই। জন্তু-জানোয়ারও কিছু নেই যে তাদের মেরে মাংস

খাওয়া যাবে। শুধু আছে কিছু ইঁদুর আর শেয়াল, তাদের মাংস তো খাওয়া যায় না।! গ্রামের কোনও মানুষ তাকে খাবার দেবে না। লোকেরা তাকে দেখলেই ভয় পায়!

একটুক্ষণ বসার পরই রণজয় ভাবল, এখানে থাকা ঠিক নয়। তাকে জলের কাছে যেতে হবে। তার এখন গায়ে এত জোর যে পৃথিবীর কোনও মানুষ তাকে আর ধরে রাখতে পারবে না। কিন্তু আকাশ থেকে মাঝে-মাঝে মানুষের মতন একরকম প্রাণী আসে তাকে বন্দি করার জন্য। ওই প্রাণীরাই আজ রণজয়ের এই অবস্থা করেছে। ওদের ছোঁয়াতেই রণজয়ের চেহারা বদলে গেছে এরকম। ওরা চায় রণজয়কে তাদের গ্রহে নিয়ে যেতে। ওরা বড়-বড় জাল ফেলে রণজয়কে ফাঁদে ফেলার চেষ্টা করে। ওদের হাতে থাকে আগুনের টর্চ লাইট। কিন্তু রণজয় কিছুতেই ধরা দেবে না। সে এই পৃথিবী ছেড়ে যাবে না। ওদের জব্দ করার একমাত্র উপায় জলের মধ্যে নেমে পড়া। ওরা জলকে ভয় পায়।

জঙ্গলের মধ্যেই একটা খাল আছে। কচুরিপানায় ভরা। রণজয় এসে তার ধারে বসে হাত দিয়ে কচুরিপানা সরাতে লাগল। খানিকটা জায়গা পরিষ্কার করার পর সে জল তুলে মুখটা ধুলো। চামড়ার ওপর জোর দিয়ে হাত ঘষতে লাগল, যদি নীল রং ওঠে। না, কিছুতেই ওঠে না। আকাশে জ্যোৎস্না রয়েছে। আয়নায় মতন জলে রণজয় নিজের মুখের ছায়া দেখল। সত্যিই, কেন লোকেরা তাকে দেখে ভয় পাবে না? এমনকী চিত্রার সঙ্গে এত ভাব ছিল, সেও চিনতে পারল না। সেও ভয় পেয়ে তার হাতে কামড়ে দিয়েছে। রণজয় এখন প্রায় সাড়ে সাত ফিট লম্বা, মুখখানাও সেইরকম প্রকাণ্ড হয়ে গেছে। মহাভারতে আছে, শ্রীকৃষ্ণের গায়ের রং নাকি নীল ছিল, কিন্তু তাকে দেখে তা কেউ ভয় পেত না।

মাথার ওপরে একটা ঘর্ঘর শব্দ হল। একটা গোল মতন জিনিস ওপর থেকে নেমে আসছে। তার থেকে টর্চ লাইটের মতন একটা সরু আগুনের রেখা এক-একটা গাছের ওপর পড়ছে, আর সঙ্গে-সঙ্গে পুড়িয়ে দিচ্ছে গাছটাকে। ওরা আবার খুঁজতে এসেছে রণজয়কে। রণজয় টুপ করে নেমে গেল জলের মধ্যে। কোনও শব্দ না করে নাক পর্যন্ত ডুবে রইল।

গোল জিনিসটা থেকে একটা দরজার মতন খুলে গেল, সেখান থেকে বেরিয়ে এল একজন মানুষ। তারপর হাওয়ায় ঠিক পাখির মতন উড়তে উড়তে নেমে এল নিচে।

এখন ওদের দেখলেই রণজয়ের রাগে গা জ্বলে যায়। দাঁত কিড়মিড় করে। হাতের কাছে ওদের একটাকে পেলে সে খুনই করে ফেলত। সে তো কোনও দোষ করেনি, তবু ওদের জন্য কেন তার এত কষ্ট! কিন্তু রণজয় ওদের কাছাকাছি যেতে সাহস পায় না। ওদের কাছে নানারকম অদ্ভুত যন্ত্রপাতি আছে।

ওরা যেন কুকুরের মতন গন্ধ শুঁকতে পারে। ঠিক যে রাস্তা দিয়ে রণজয় এসেছিল, সেই রাস্তা ধরে লোকটা হেঁটে এসে খালের ধারে দাঁড়াল। যদিও সে কোনও শব্দ উচ্চারণ করলে না, তবু রণজয় স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে যে সে বলছে, নীলমানুষ, লুকিয়ে থেকো, আমাদের সঙ্গে চলে এসো। এখানে তুমি বাঁচতে পারবে না। আমাদের সঙ্গে এসো!

রণজয় কোনও উত্তর দিল না। সে যে এখানে আছে সেটা বুঝতে না দিয়ে ডুবে গেল জলের মধ্যে। ডুব সাঁতার কেটে চলে গেল অনেকখানি।

একটু বাদে লোকটা আবার উড়তে-উড়তে উঠে গেল ওপরে। রণজয়ের খুব ইচ্ছে করেছিল লোকটার গায়ে জলের ছিটে দেয়। ওরা যখন জলকে এত ভয় পায়, তখন নিশ্চয়ই জলের ছোঁয়া লাগলে কুঁকড়ে যাবে। কিন্তু এবার আর তা করা গেল না।

একটুক্ষণ অপেক্ষা করে রণজয় আবার ওপরে উঠে এল। কিছু খাবার জোগাড় করতেই হবে। কোনও দিন সে চুরি-ডাকাতি করেনি, এবার বাধ্য হয়েই তা করতে হবে, উপায় কী?

আবার হাঁটতে শুরু করল সে। জঙ্গলের অন্য পাশ দিয়ে একটা বড় রাস্তা গেছে। সেখানে রাত্তিরবেলা অনেক লরি যায়। ইচ্ছে করলেই সে জোর করে একটা লরি থামাতে পারে। কিন্তু লরিতে তো আর খাবার পাওয়া যাবে না।

অন্ধকার গাঢ় হওয়ার পর সে আবার একটা গ্রামে ঢুকে পড়ল। চুপি চুপি এক একটা বাড়ির জানলা দিয়ে উঁকি দেয়। কোনও কোনও বাড়িতে সে দেখতে পায়, লোকেরা খেতে বসেছে। তার জিভে জল আসে। ভিখিরিরাও এই সময় চাইলে কিছু খাবার পেত। কিন্তু তাকে তো কেউ ভিক্ষে দেবে না।

একটা বাড়ির উঠোনে একটা গাছে হলদে-হলদে কী যেন ফল ফলে আছে। সে ভাবল পেয়ারা। পট-পট করে কয়েকটা ছিঁড়ে নিয়ে দেখল, পেয়ারা তো নয়, পাতিলেবু। খালি পেটে কেউ লেবু খায় নাকি! তবু খিদের চোটে সই লেবুগুলোই নোখ দিয়ে চিরে রস চুষে চুষে খেতে লাগল। একটু নুন থাকলে তবু ভালো হতো। দাঁত টকে গেল একেবারে!

আর একটা বাড়ির পেছনে মস্ত বড় খাঁচায় অনেকগুলো মুরগি রয়েছে। একটা মুরগি চুরি করে নিলে বেশ হয়, কোনওরকমে আগুন জেলে ঝলসে খাওয়া যায়।

এরকম চিন্তায় রণজয় নিজেই অবাক হয়ে গেল। সে কলেজে পড়াশুনো করেছে। এখন রবীন্দ্রনাথের কবিতা মুখস্থ বলতে পারে। কদিন আগেও সে ছিল অন্য যে-কোনও ছেলের মতন। এখন চেহারাটা বড় হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে কি সত্যি দৈত্য হয়ে যাচ্ছে নাকি? কোনওদিন মানুষ ধরে ধরে খাবে? না, না, এরকম করলে হবে না। তাকে। মানুষই থাকতে হবে।

কিন্তু খাবার তো জুটছে না। রণজয় নিজের বাড়িতেও আর ফিরে যাবে না। তার বাবাই তাকে দেখে ভয়ের চোটে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন। জ্ঞান ফিরেই পেয়েই বলেছিলেন, দূর হ, দূর হয়ে যা! ভূত হয়ে কেন জ্বালাতে এসেছিস আমাদের! সে যতই বলেছিল, আমি ভূত নয়, কেউ বিশ্বাস করে না। তার গলার আওয়াজও বদলে গেছে।

ঘুরতে-ঘুরতে রণজয় দেখল, একটা বাড়ির দরজার বাইরে থেকে তালাবন্ধ। ভেতরটা অন্ধকার। রণজয় তালাটা ধরে একটু চাপ দিতেই মট করে তালাটা ভেঙে গেল। দরজা ঠেলে সে মাথা নীচু করে ভেতরে ঢুকল। বাড়ির সামনে একটা বড় উঠোন, চারদিকে দেয়ালঘেরা। রণজয় সেটার ভেতরে ঢুকতেই একটা কুকুর ঘেউ-ঘেউ করে তাড়া করে

এল। কুকুরটা কাছে আসতেই রণজয় সেটার চার পা ধরে ছুঁড়ে দিল পাঁচিলের বাইরে। বাইরে পড়েই কুকুরটা কেঁই-কেঁই করতে-করতে দূরে পালিয়ে গেল খুব ভয় পেয়ে।

বাড়িতে আর কোনও মানুষজন নেই। রণজয় খুঁজতে লাগল রান্নাঘর। রান্নাঘরে খাবারদাবার কিছু নেই। কয়েকটা আলু আর পেঁয়াজ রয়েছে একটা ঝুড়িতে। আর কয়েকটা হাঁড়ি কুঁড় ঘেঁটে চাল আর ডালও পাওয়া গেল। রণজয় ঠিক করল সে রান্না করেই খাবে। উনুনের পাশে দেশলাই রয়েছে। রণজয় খানিকটা চেষ্টা করে।

রান্না-টান্না সে কখনো করেনি। কিন্তু খিচুড়ি তো সবাই রাঁধতে পারে। একটা হাঁড়িতে অনেকখানি জল নিয়ে তার মধ্যে বেশ খানিকটা করে চাল আর ডাল ঢেলে দিল। এবার তো আপনা-আপনি খিচুড়ি হয়ে যাবে। কয়েকটা আলু আর পেঁয়াজও ছেড়ে দিল তার মধ্যে। নুনও আছে, দিব্যি খাওয়া জমবে।

সবসুদ্ধু উনুনে চাপিয়ে দিয়ে রণজয় ব্যগ্র হয়ে বসে রইল। কতক্ষণে রান্না হবে? সে আর ধৈর্য ধরে থাকতে পারছে না। প্রতিটি মিনিট মনে হচ্ছে এক ঘণ্টা। সামনে বসে থাকলে আরও বেশি খিদে পায়। সে রান্নাঘর ছেড়ে উঠে এল। অন্য একটা ঘরে এসে শুয়ে পড়ল খাটের ওপর। উঃ কতদিন পর সে খাট বিছানায় শুচ্ছে! ঘুমিয়ে পড়লে চলবে না। খিচুড়ি যদি পুড়ে যায়। তা ছাড়া খিচুড়ি খেয়েই তাকে বেরিয়ে পড়তে হবে। বাড়ির লোকেরা যেকোনও সময় ফিরে আসতে পারে। ভোরের আলো ফুটবার আগেই তাকে পালাতে হবে জঙ্গলে।

রণজয় একটুক্ষণ মাত্র শুয়েছিল, তারপরেই খুটখাট শব্দ হল বাইরে। এই রে, বাড়ির লোকরা ফিরে এসেছে! রণজয় বাইরে বেরিয়ে পাঁচিল টপকে পালিয়ে যেতে পারে। কিন্তু খিচুড়ি খাওয়া হবে না। বাড়ির লোকেরা রান্নাঘরে আপনাআপনি খিচুড়ি রান্না হতে দেখে কী অবাক হবে!

ফিস-ফিস করে কারা যেন কথা বলছে। রণজয় দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়াল। সরু একটা টর্চের আলো পড়ল ঘরের মধ্যে। এই রে, অন্য গ্রহের অধিবাসীরা কি এখানেও রণজয়কে

খুঁজতে এসেছে নাকি? রণজয় ঠিক করল, তা হলে দরজার খিলটা খুলে নিয়ে ওদের মধ্যে মাথা ফাটিয়ে দেবে। কিছুতেই ধরা দেবে না সে।

দুটো লোক ঘরের মধ্যে ঢুকল। অন্য গ্রহের নোক নয়, তারা মানুষ। দেখলেই বোঝা যায়, এ বাড়ির লোক নয়, চুরি করতে এসেছে।

মাঝখানের আর একটা দরজা খোলা ছিল, রণজয় সেটা দিয়ে পাশের ঘরে চলে গেল। দাঁড়িয়ে রইল অন্ধকারে। তোক দুটো সারা ঘরে আলো ফেলে দেখে নিল আগে। তারপর দেয়াল-আলমারির তালা ভাঙতে লাগল।

বাড়িটা খুব একটা বড়লোক কারুর নয়। সাধারণ বাড়ি। চোর দুটো তাদেরই সর্বনাশ করেতে এসেছে। আগে চোরের কথা শুনলে রণজয়ের ভয় করত, এখন মজা লাগছে খুব।

আলমারি থেকে কী যেন ঝনঝন করে নীচে পড়ল। চোর দুটো খুব ফিসফাস করে যাচ্ছে।

খানিকটা বাদে একটা চোর এদিকে উঠে এল। মাঝখানের দরজাটার পাশ দিয়ে যেতেই রণজয় লম্বা হাত বাড়িয়ে চোরটার ঘাড় ধরে তুলে নিয়ে এল। সে কোনওরকম শব্দ করার আগেই রণজয় চেপে ধরল তার মুখ। এ ঘরেও বিছানা পাতা ছিল, একটা বালিশের তোয়ালে দিয়ে ওর মুখটা বেঁধে ফেলল। তারপর চাদর দিয়ে হাত-পা বাঁধল ভালো করে। এবার সে লোকটাকে কাঁধে নিয়ে পা টিপে টিপে বেরিয়ে এল উঠোনে। বাইরে চাঁদের আলোয় রণজয়ের চেহারা দেখে চোরটার যেন ভয়ে চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাইল। কিন্তু কোনও শব্দ করতে পারছে না। তাকে মাটিতে শুইয়ে রেখে রণজয় আবার ফিরে এল ভেতরে।

বাকি চোরটা মন দিয়ে চুরি করে যাচ্ছে। আলমারি থেকে অনেকগুলো স্টীলের থালাবাসন থলিতে ভরেছে। একটা ছোট লোহার বাক্স নিয়ে নাড়াচাড়া করছে এখন। সেটা কিছুতেই খুলতে পারছে না।

রণজয় ঠিক চোরটার পেছনে গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল। চোরটা তার বাটালি, ছোট হাতুড়ি, একটা করাত রেখেছিল পাশে। রণজয় টুকটাক করে এক-একটা সরিয়ে নিচ্ছে। লোকটা করাতটা খোঁজার জন্য পাশে হাত দিয়ে পেল না। খুব অবাক হয়ে বলল, আরেঃ! তারপর হাতুড়িটাও পেল না। তখন ফিসফিস করে ডাকল, এই হেবো, হেববা! তুই হাতুড়ি আর করাত নিয়েছিস?

কোনও সাড়া নেই।

চোরটা আবার ডাকল, এই হেবো, হেববা! কোথায় গেলি!

রণজয় চোরটার মাথার চুল ধরে পেছন থেকে একটু টান দিল। লোকটা উঃ বলে পেছন ফিরে তাকাল।

এই চোরটা কিন্তু আগের চোরটার থেকে অনেক বেশি সাহসী। গায়ে জোরও বেশি। রণজয়কে দেখেই তাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়াতে গেল। রণজয় তার ঘাড়টা চেপে ধরে বলল, কোথায় যাচ্ছ চাঁদু?

চোরটা সঙ্গে সঙ্গে কোমর থেকে একটা ছুরি বার করে সোজা বসিয়ে দিল রণজয়ের বুকে। রণজয় পেছন দিকে উলটে পড়ে গেল। বুক থেকে রক্ত বেরুচ্ছে ফোয়ারার মতন।

রণজয়ের মনে হল, এবার সে মরে যাচ্ছে। ভাবল, যাক, ভালোই হল। এরকম ভাবে দৈত্য হয়ে বেঁচে থেকে লাভ কী? কিন্তু মরার আগে খিচুড়িটা খাওয়া হল না?

একটু বাদে সে আবার ভাবল, কই, মারলাম না তো এখন! ব্যথাও করছে না। চোরটা উঠে দাঁড়িয়ে টর্চ ফেলে আছে তার দিকে। রণজয় একটানে ছুরিটা তুলে ফেলল। তারপর সে একটা অদ্ভুত জিনিস দেখল। তার বুক থেকে যে রক্ত বেরিয়ে ছিল, সেটা জমে গেছে এরই মধ্যে। রবারের মতন শক্ত। রক্তের ফোয়ারাগুলো কতকগুলো নীল রবারের সুতোর মতন ঝুলছে তার বুক থেকে। রণজয় পটপট করে টেনে-টেনে সেগুলো ছিঁড়তে লাগল।

লোকটা এবার ভয় পেয়েছে। টর্চ খসে পড়ল হাত থেকে। আঁ-আঁ করে চেঁচিয়ে উঠল। পালাবারও শক্তি নেই।

রণজয় উঠে দাঁড়িয়ে লোকটাকে দুহাতে শূন্যে তুলে ছুঁড়ে ফেলল ঘরের মেঝেতে। আবার সেইভাবে তুলতে যাচ্ছিল, কিন্তু আর একবার ওই রকম ছুড়লে লোকটার একটাও হাড় আস্ত থাকবে না। রণজয় এই চোরটারও মুখ, হাত-পা বাঁধল। বাইরে উঠোনে এনে রাখল অন্য চোরটার পাশে।

তারপরই রণজয় ছুটে গেল রান্নাঘরে। খিচুড়ি পুড়ে গেছে নাকি? না, পোড়েনি, সবেমাত্র ফুটে উঠেছে।

তাড়াতাড়ি হাঁড়িটা উনুন থেকে নামিয়ে ফেলল। আর থালা-টালায় ঢালা হল না, হাঁড়ি থেকেই সেই গরম-গরম খিচুড়ি খেয়ে ফেলল সবটা। নিজের হাতের রান্না তো, অপূর্ব স্বাদ লাগল। পেট ভর্তি হওয়ায় বেশ তৃপ্তি করে সেঁকুর তুলল একবার।

বাইরে বেরিয়ে এসে চোর দুটোকে একটা সরলরেখার মতন লম্বা করে সজিয়ে দিল উঠোনে। বাড়ির লোকজন ফিরে এলেই যাতে দেখতে পায়। চোর দুটো এক-একবার রণজয়ের দিকে তাকাচ্ছে আর ভয়ে চোখ বুজছে।

এবার রণজয়কে যেতে হবে। বাড়ির লোকরা ফিরে এসে চোর দুটোর কাছে নিশ্চয়ই একটা সাংঘাতিক গল্প শুনবে। সবাই ভাববে, এক দৈত্য এসে ওদের বন্দি করে গেছে। নিজেকে দৈত্য ভাবতে খুব খারাপ লাগে রণজয়ের। সে যদি মানুষের উপকার করে এখন থেকে, তাহলেও কি তাকে দৈত্য ভাববে মানুষ?

আবার বাড়ির মধ্যে ফিরে গিয়ে খুঁজে-খুঁজে রণজয় কাগজ আর পেন্সিল জোগাড় করল। তারপর একটা চিঠি লিখল :

মহাশয়, আমি আপনার বাড়িতে খিচুড়ি খেয়েছি বটে, কিন্তু তার বদলে এই চোর দুটোকে ধরে দিয়েছি। আমি হঠাৎ এই সময় না এলে, এরা আপনার সবকিছু নিয়ে পালাত।

সুতরাং, আশা করি, আপনার খানিকটা চাল আর ডাল খরচ হওয়ার জন্য দুঃখিত হবেন না। ইতি নীল মানুষ।

চিঠিটা চোর দুটোর পাশেই একটা ইটে চাপা দিয়ে রাখল রণজয়। আপনমনেই বলল, দেখা যাক, এর পরেও ওরা আমাকে দৈত্য ভাবে কিনা। তারপর দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে সে বেরিয়ে গেল বাড়ি থেকে। যদিও সে জন্তু নয়, তবু এখন তাকে আবার জঙ্গলে ফিরে যেতে হবে।